পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

আর এখন অলমোস্ট পাগল এ মন

সব কবিতার শেষ পংক্তিতেই এক মৃত্যুর অনুভূতি ফিরে আসে। আর এই ফিরে আসাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফিরে আসা ফিরে যাবার এক দারুণ প্রয়াস। মৃত্যুও জীবনের এক ঘোরতর ফেরা। বিলীন আত্মার জীবনের পাতায় যা আমাদের ফেরায়। একটা পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। বহুকালের না-দেখা ছবি আমরা আবার দেখি, চেয়ে দেখি, পড়ি সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া লিপি। ঈভ বনফোয়ার একটা কবিতায় সঙ্গমকালীন প্রেমিকার মৃত্যুর প্রসঙ্গ ছিলো। প্রবিষ্টা প্রেমিকার স্পর্শান্দোলন, তার রক্ত, রস কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ভীষণ ঠান্ডা। সে কথার জবাব দেয় না। স্পর্শেরো না। তার বোন, মাংশ, পেশি সব এলিয়ে পড়ছে। প্রেমিকার এই সহসা মৃত্যু প্রেমিকের বয়ানে পুনর্জন্মের আগের অবস্থা। সত্যি ! বিশেষত আমাদের পরিচিত আয়তক্ষেত্র, যেখানে পুর্নজন্মের ভাবনা অঙ্গাঙ্গী, মৃত্যুকে একটা পূর্বাবস্থা ভাবা অনায়াস।

কবিতার জগত অনেক অস্বচ্ছ পরিচিতি আনে। কত মানুষ, কবি - যাদের ভালো ক'রে চিনি না তবু প্রায়শই তাদের নামে ছাপার অক্ষরে দেখতে দেখতে তাদের একরকম চেনা হয়ে যায়। এমন কেউ আচমকা চ'লে গেলে কোথায় একটা বিয়োগের যোগ লেগে থাকে বেশ কয়েকদিন। এই সময় আমরা আচমকা সুন্দর হয়ে উঠি। রাগ, উষ্মা পেছনের সীট নেয়। জীবনের দিনগুলোয় একটা উদাসীনতা তার মেঘ নিয়ে আসে। অসমপৃক্ত ভাবনা, ছবি, লেখা চোখে মেঘলার মন আনে। 'মেঘমা' নামে একটা পাহাড়ি গ্রামের কথা আচমকা ভেসে আসে। এইসব।

সম্প্রতি মল্লিকা সেনগুপ্ত-র মৃত্যুর খবর এলো। ওঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিলো না কোনোদিন। কিন্তু সুবোধদার সাথে ছিলো। অন্তত একবার ওঁদের ডেরায় দেখা হয়েছিলো। বছর সাতেক আগে এক রবিবার সকালের আড্ডায়। কবি দম্পতির সঙ্গে বহুক্ষণ আড্ডা পরেও আমার ছেলের বয়সী তাঁদের কিশোর পুত্রটি সবচেয়ে মন কেড়েছিলো। ওর কথা শুনতে ইচ্ছে করেছিলো খুব। ওর আচমকা খারাপ হয়ে যাওয়া কম্প্যুটার নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ লড়েছিলাম। মল্লিকাদির শারীরিক অবস্থার কথা শুনেছিলাম সুবোধদার মুখেই। গতবছর কলকাতায় থাকার সময় শুনেছিলাম কিছুটা উন্নতির কথা। তাই এই তেতো খবরে অনেকটা ধাক্কা ছিলো। সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিলো মল্লিকাদির ছেলেটির মুখ। মাস ঘুরতে না ঘুরতেই নতুন দুঃসংবাদ ! তাপস লায়েক। ওকে একেবারেই চিনতাম না। কিন্তু ওই যে ! ছাপার অক্ষর। যার প্রতি আনুগত্য আমাদের অনেক বড় জগতের বাসীন্দা ক'রে তোলে। সে এক বিরাট পৃথিবীর হদিশ দেয়। বড় পৃথিবীর নাগরিকত্বের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়।

বহুকাল আগে একটা ছেলের কথা মনে পড়ে যায়। প্রায় আমাদের সমবয়সী। সৌমিত বসুর ভাই। কি যেন নাম ওর ? সৌমেন ? না সোমেন। সৌমিত তখন হাজরার কাছে একটা মেসে থাকতো। আমার বাড়ির এত কাছে একটা মেস আছে আমি জানতাম না। একদিন সৌমিতের মেসের সেই এক চিলতে ঘরে আড্ডা দিতে যাই। সৌমিতকে তখন 'সৌমিতদা' বলতাম। সে বোধহয় আমার চেয়ে বছর খানেকের বড় ছিলো। এই রকমই সময় সৌমেনের আত্মহত্যার খবর আসে। সৌমেন লিখতো। অনেক কাগজে। তরুণ কবি হিসেবে ওর পরিচিত তৈরি হচ্ছিলো ৯০-এর গোড়ায়। একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। আমি সৌমেনকে চিনতাম না। সৌমেন কাকদ্বীপে থাকতো। সৌমেন কবিতা লিখতো। সৌমেন একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। 'সৌমেন' তার নাম কিনা তাও আজ মনে করতে পারিনা। তবু কেন ওর কথা মনে পড়ছে। ক'দিন আগে বাংলাদেশের এক তরুণ কবির সাথে কথা হচ্ছিলো। কথায় কথায় সে বলে - 'দাদা, আপনি এত পরীক্ষা কবিতার কথা বলেন, এত ইন্টেলেক্চুয়াল লেখালিখি, কিন্তু আপনি নিজে যে এত ইমোশনাল এটা কিন্তু জানতাম না......'।

এর কোনো উত্তর হয়না। নদীমাতৃক দেশের ছেলেরা এমনই হয়। তাদের সবকিছুই একটু বেশি বহতা হয় - অনুভূতি, মেধা, আবেগ, বীর্য, অশ্রু - সব। ঋত্বিক ঘটকের কথাই হোক না। সামান্য দূরত্বে ওই অন্য জমি। অন্য দেশ। অন্য নদী। চেনা মানুষ। যা নিজেদের ছিলো। আজ আর নেই। তার জন্যই কি হূতাশন ! ফিল্ম আফটার ফিল্ম। ওইটুকু দূরত্বেই ঐ, আর আমি তো বাংলা ভাষার ভূখন্ডের উল্টোদিকে। পৃথিবীর উল্টো পৃষ্ঠায়। ৮৩ সালের জয়েন্ট এনট্রান্সে অঙ্কের প্রশ্নপত্রে একটা প্রশ্ন ছিলো যা

কেন জানি আজ বারবার ফিরে আসে। প্রশ্ন ছিলো - মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবী ছেদ ক'রে যদি একটা টানেল তৈরি করা যায়, আর সেই টানেলের মুখে যদি একটা কর্কের ছিপি ফেলে দেওয়া যায় তবে সেই ছিপির গতিবিধি কি হবে ? কেন ? প্রমাণ ক'রে দেখাও।

দেখিয়েছিলাম। অঙ্ক ক'রে আমরা দেখিয়েছিলাম সে ছিপি সিম্পল হারমনিক মোশন অনুযায়ী এদিক থেকে ওদিক আসা যাওয়া করতে থাকবে। তার টাইম-পিরিয়ডও বের ক'রে দেখাতে হয়েছিলো। আজ সে ছিপি উপমা হয়েছে। হায় ! যদি জীবন যদি সেই কর্কের ছিপির মতো হতো। শুক্রবার অফিস থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে পড়ি। ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে ওহায়ও নদীর ধারে। কাফে 'হুয়ানিতা' (Juanita)য় ঝাক রুবোর একটা বই পড়তে পড়তে একটা গোটা বোতল টেকিলা শেষ ক'রে ফেলি। সারাক্ষণ সৌমেনের কথা মনে হ'তে থাকে। অথচ আমি সৌমেনকে চিনতাম না। তার নাম 'সৌমেন' না 'সোমেন' সেটাও মনে নেই। কিন্তু সৌমিতের কাছে শুনেছিলাম সে তার শেষ নোটে লিখেছিলো - এই মৃত্যু কবিতার জন্য। সম্ভবত নোটটা মাকে লেখা। কাফে হুয়ানিতায় একটি ২৭-২৮ বছরের ওয়েট্রেস আছে যার নামও 'হুয়ানিতা'। ডিম, কমলা-ভাত আর টেকিলার দ্বিতীয় বোতলটা নামিয়ে দিতে গিয়ে সে আমার চোখের দিকে তাকায় আর ব'লে - 'আর য়্যু অলরাইট হানি ? ওয়্যাট ইস দ্যাট বুক ?' হুয়ানিতা ভাবে ওই হাতে ধরা বইটাই এইসব সজলতার অভিকর্ষ। মলিন হেসে বলি, 'য়্যাম ফাইন। হাউ ইস ইয়োর সান নিতা, ডিয়ার ?' দ্বিতীয় বোতল টেকিলা শেষ হবার পর বুঝি এখন আর বাড়ি ফেরা যায় না। বার থেকে বেরিয়ে রাস্তা টপকে টিলার ওপরের মাঠে একমাত্র বেঞ্চে গিয়ে বসি। ব'সে থাকি। নিচে ঢালু মাঠ। এখন গ্রীষ্ম। তাপমাত্রা ৮৮-৮৯। সৌমেনের কথা ভাবতে থাকি। দ্য অলমোস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট সৌমেন। আর আমার প্রিয় অনুজ, বন্ধু লেখক/সঙ্গীতজ্ঞ অনুপমের (রায়) ভাষায় বলতে হয়, 'আর এখন/ অলমোস্ট পাগল এ মন'।

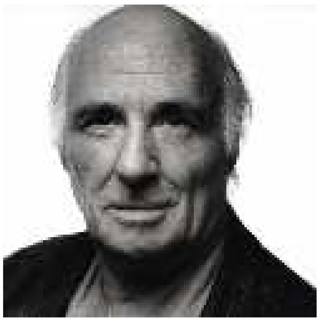

ঝাক রুবো (Jacques Roubaud)

হুয়ানিতা আমার হাতের বইটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলো। বইটা সদ্য কিনেছি। এই সমস্ত মৃত্যু সংবাদ আসার সাথে সাথে। ঝাক রুবোর বই। নাম 'কালো একটা কিছু' - some thing black। খুবই বিরল বই। এদেশে সর্বত্র পাওয়া যায় না। ঝাক রুবো বিশ শতকের ফ্রান্সে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। সকলে কে ডাকে চেনেন। য়্যুলিপো (OULIPO - Ouvroir de littérature potentielle – *সম্ভাবনা সাহিত্যের কর্মশালা*) আন্দোলনের পথিকৃত। ঝাক বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন এক তরুণীকে - এলিক্স ক্লেও রুবো। এলিক্স তরুণ-তিরিশেই পালমোনারি এম্বাওসিসে আচমকা মারা যান। ১৯৮৩ সালে এলিক্সের মৃত্যু আসে আচমকা, এক বাজের ছোঁ- এর মতো। মাত্র ৩১ বছর বয়সে। ঝাক এলিক্সের চেয়ে প্রায় বিশ বছরের বড়। এই ৮০- র দশকেই ক্যালিফর্নিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে নিঃসঙ্গতার প্রকোপে মানুষের আয়ুহ্রাস হয়। আর নারীর মনোকষ্ট ও নির্জনতা সাধারণত চূড়ান্ত হয় সন্তানের মৃত্যুতে, পুরুষের ক্ষেত্রে - স্ত্রী। এলিক্সের মৃত্যুর পরপরই কিন্তু রুবো একটা ছোট কবিতা লেখেন – "শূন্যতা"। না- থাকার ভয়াবহতার ওপর সব রকমের নৈসর্গিক কপাট হাঁ ক'রে খুলে দিয়ে রুবো লিখছেন –

এখন থেকে এই
একটুকরো আকাশ
তোমার উত্তরাধিকার

যার ভেতরদিকে
বেঁকে ঢুকে আছে

গির্জার অন্ধ দেয়াল

একটা চেস্টনাট গাছ
তার   কেন্দ্রে জটিলতা আনে

এখানে সূর্য
পাতাদের
দোনামনায়

আর একটু লাল

যার পরেই পৃথিবী ওগরায়

এত অভাব
যে তোমার চোখ
এগোতে এগোতে পায়
স্রেফ শূন্যতা

তারপর দীর্ঘ ২-৩ বছর ওঁর সমস্ত লেখা বন্ধ হয়ে যায়। স্ত্রীর মৃত্যু সেই বন্ধ্যা দেশে বন্দী ক'রে রাখে। প্রায় তিরিশ মাস রুবো আর কিছু লিখতে পারেন নি। কলম মনের সাথে, শব্দ নাড়ির সাথে প্রতিনিয়ত বিবদমান থেকেছে। যুদ্ধ বেঁধেছে। আনাত্মার সঙ্গ, অর্থহীনতার নিয়মপালন অসহ্য। অভাবের রক্তে কোন রঙ নেই। তারপর এক সময় এলিক্সের স্মৃতি ভেজানো লেখা আসতে থাকে। প্রেমের কবিতা। একের পর এক। সেই লেখা জড়ো ক'রে রুবো একটা বই করেন - some thing black। এলিক্স ৮০ সালে কিছু অদ্ভুত ছবি তুলেছিলেন। সেই সিরিজটার নাম দিয়েছিলেন –"যদি কিছুটা কালো" –if something black । সেই ছবিগুলো সম্বল ক'রে বই বেরোয়।

এক জায়গায় রুবো লিখছেন –

কোথায় তুমি ?
কে?
বাতির নিচে   ঘেরা আঁধারে আমি তোমায় ছড়িয়ে পাতিঃ
দু- মাত্রায়
রাত নামে
আলোর দেবদূতের নিচে। ধুলোর মতোঃ
এক বিষয়বস্তুহীন প্রতীতী   অশরীরী কন্ঠস্বর
এই মাটি
যা তোমার গায়ে লাগে
এই পৃথিবী
যার থেকে তোমায় এখন কেউ বিচ্ছিন্ন করে না

বাতির নিচে। রাতে। ঘেরা আঁধারে। দরজার গায়ে

এলিক্সের তোলা ছবি - ফাঁকা ঘরে জানলার সামনে নানা মুদ্রায় এক নগ্নিকা ও তার অল্টার-ইগো বা তার বিকল্পসত্ত্বা আর এক নগ্নিকা। এক এক ছবিতে জানলার আলোর প্রবেশ ও পরিসরণ এক এক রকমের।

গণিতের অধ্যাপক রুবো মিলিয়ে যাওয়া নারীর প্রতি প্রেমের কবিতায় এক অদ্ভুত যুক্তির জাল বিছিয়ে দেন। যেন মনে হয় "শূন্য" সংখ্যাটির তাৎপর্য পুনরাবিষ্কৃত করতে চান। যে নেই তাকে যে কোনোভাবেই আর হারানো সম্ভব নয়, তার অসমাপ্তকে, ফেলে যাওয়া অসম্পূর্ণ ছবি, বাক্য, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধকে অবলম্বন করে যে অদ্ভুত রক্ত- মাংশের এক আস্তিক্য গড়ে তোলা সম্ভব, রুবোর কবিতা তাকে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। মাঝে মাঝেই "না- থাকা"- র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলা আলোকদার (সরকার) অনেক কথা, ভাবনা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর পাবার পরের কয়েকদিন রবির কথা। তাঁর দরজা বন্ধ ক'রে কক্ষনির্বাসন নেবার কথা। মায়ের মৃত্যুর এক বছর পর তাঁর শ্রাদ্ধ (কাদিশ) না- করা এলেন গিন্সবার্গ বুক- ফাটা হুতাশনের মধ্যে দিয়ে ওঁর শ্রাদ্ধ করেন। এক দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে – কাদিশ, যা কিনা ওঁর দ্বিতীয় বই (১৯৬১)। আজো "কাদিশ'কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

অনেকে গুরুত্ব দেন। অথচ বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন যে কাদিশ মা- মরা বাঙালী ছেলের আবেগী বিলাপ ছাড়া কিছু নয়। এর যে কি সাহিত্যমূল্য থাকতে পারে বুদ্ধদেব বোঝেন নি। ৫০ বছর পেরিয়ে এসে আমিও বুঝিনা। বুদ্ধদেব বসুর আন্তর্জাতিক সাহিত্যবোধের প্রতি নতমস্তক হ'তে হয় বারবার। কৌতূহল হয় এই ভেবে - বুদ্ধদেব কি বলতেন রুবোর কবিতা পড়ে।

মৃত্যুর ঘোড়াটাকে নিয়ে আর তার লাগোয়া কবিতার জুড়িগাড়ির কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার মাঠ-ঘাট চেনা যায় তো বাড়িটা না, বা তার উল্টোটা। আবার আমাদের ভাবনা অরৈখিক চরিত্রের কথা ওঠে। মৃত্যুঘটিত কবিতার কথা ভাবতে ভাবতে কবির মৃত্যু। আর কবির মৃত্যু মনে হলেই বাঙালী কবি হিসেবে আমি প্রথমে অব্যর্থভাবে জীবনানন্দকে ভাবি, আমাদের বাড়ির সামনের সেই ট্রামপংক্তি যেখানে বাংলা কবিতার অত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এক অক্ষর কাটা পড়লো কি অবলীলায়! ভাবি যোগব্রত, তুষার ও ফাল্গুনি রায়ের কথা, অনন্য রায়ের মৃত্যুর কথা - এইসব ভাবতে ভাবতে রবিতে এসে ঠেকি। বাইশে শ্রাবণ এগিয়ে আসছে। সার্ধ-শতবর্ষের কথা মনে পড়ে। আবছা আবছা মনে পড়ে কিশোর বয়সে পড়া রমাপদ চৌধুরীর এক অল্প বয়সের গল্প বা উপন্যাস - যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রাতঃকালীন অভিসার সেরে ফেরার পথে দেখে রাস্তায় ভিড়। এক দেহাতী ফলবিক্রেতা না রিকশাওয়ালাকে নায়ক জিজ্ঞেস ক'রে কি হয়েছে? সে বলেছিলো রবিন্দরনাথ নামে কে একজন মারা গেছে - হোগা কোই নেতা-উতা ; রমাপদর নায়ক সেই গরীব দেহাতী লোকটার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করেছিলো - আজ এসব মনে ক'রে সরল দেহাতী লোকটার জন্য মুষড়ে পড়ি। বরং রমাপদ-র নায়কটিকেই সামনে পেলে .....।

যাইহোক এই রকম অরৈখিক এক মন শেষমেশ রবির মৃত্যুদৃশ্যে গিয়ে স্থির হয়। গুরুলোভী অশিক্ষিত বাঙালির হাতে প'ড়ে মৃতকবির কি নাজেহাল অবস্থা সেদিন! এসব নতুন কাহিনী নয়। শেষযাত্রার একটা না দুটো ফিল্ম তোলা আছে। তার অবস্থা সঙ্গিন, তবু ছবি। কিছুমিছু দেখা যায়। আর কিছু থাক বা না থাক মানুষ মৃত রবির চুলদাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছে - এই দৃশ্য অন্তত নেই। এইসমস্ত ভাবনার সুবাদেই কতদিন পর রডনির কথা মনে পড়লো।

রডনি কেনেক (Rodney Koeneke) আমার চেয়ে বয়সে সামান্য ছোট। মার্কিন কবি। থাকেন ওরেগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ড শহরে। ওর কবিতা পড়ার আগেই অবশ্য রডনির গদ্য পড়ি আন্তর্জালে। বেশ কয়েকটা ভারতীয় ছবির আলোচনা - তার মধ্যে 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র মননঋদ্ধ আলোচনা সে সময়ে খুব কাজে লেগেছিলো। আমি আর প্যাট ক্লিফোর্ড তখন আমাদের প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'চতুরাঙ্গিক/SQUARES ' লিখছি। রডনির ব্লগে সত্যজিতের 'চিড়িয়াখানা' নিয়েও একটা আলোচনা ছিলো। যাইহোক, এসবের ভিত্তিতে আলাপ শুরু হবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদেরই সিনসিন্যাটি শহরের এক ক্ষুদ্র প্রেস থেকে বেরোলো রডনির কবিতার বই - 'Rules for Drinking Forties' (চল্লিশোর্ধদের জন্য মদ্যপানের নিয়মাবলি, ২০০৯)। ছোট্ট চটি বই, কিন্তু তার ছাপা, বাঁধানো অদ্ভুত সুন্দর। পুরোটাই হাতে গড়া। তেমনি সুন্দর ও তাজা সে বইয়ের কবিতা। বহু কবিতা বিশেষ মানুষের নামে। কবিতার ভাষা যেমন নিজস্ব সুন্দর, তেমনি তীর্যক ও সরস রডনির কথ্যভঙ্গি। সেই বইয়ের একটা ছোটো কবিতার নাম - ' rabindranath tagore'।

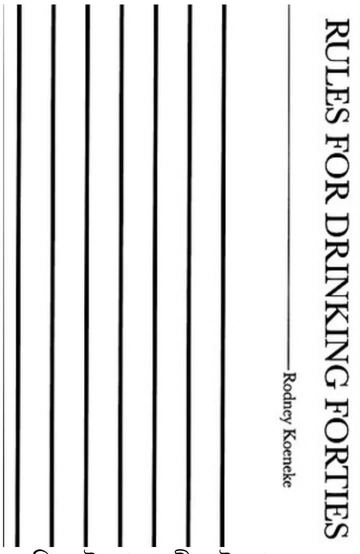

রডনির বই। প্রকাশনী সাই-প্রেস।

এই কবিতা নিয়ে রডনি কেনেকের সাথে অল্প আলোচনা হয়েছিলো। সে বলেছিলো youtube-এ বাইশে শ্রাবণে তোলা সেই শ্মশানযাত্রার ছায়াছবি দেখতে দেখতে তার মনে নানা টুকরো টুকরো ভাবনার ছিলকা জমে উঠেছিলো। সেই খোসাই ছাড়াতে ছাড়াতে পাওয়া যাবে এই কবিতার কালো ভ্রমরকে -

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনের ওপর
ফাঁকা ফুল
সাদা ট্রেন

শক্ত *কার্বনবাতি*
ছোপছোপ রাত
ম্যানসনের প'রে

ঘন ফুটেজ
ব'লে চাঁদ
কেন ওই তরী

কমরেড
লোকে ব'লে
ওর হৃদয় খোঁজো

বইয়ের মতো
সঙ্গীতের
চলচ্চিত্রের ভেতর

একটা বাস
তার পাশে
ভাড়া ছড়াচ্ছে